

ছোট গল্প

দুৰ্বুদ্ধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ভিটা ছাড়িতে হইল । কেমন করিয়া, তাহা খোলসা করিয়া বলিব না , আভাস দিব মাত্র ।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার , পুলিশের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি । যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না , সুতরাং নর এবং নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল । যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল ।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল । তাঁহার একটি অরক্ষণীয় আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন । কিন্তু , শশী আমার একমাত্র কন্যা , মাতৃহীনা , তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না । বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভলগ্নই ব্যর্থ হইল । আমারই চোখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চড়িল , আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির বাড়িতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম ।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে । কিছু সুবিধামত টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব , এমন আশা পাইয়াছি । সেই কর্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শুভকর্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব ।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম , এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল । কথাটা এই , তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে , শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে । এক্ষণে পুলিশ তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত ।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে । আমি ডাক্তারও বটে , দারোগার বন্ধুও বটে , কোনোমতে উদ্ধার করিতে হইবে ।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর কখনো খিড়কি-দরজা দিয়া অনাহৃত আসিয়া উপস্থিত হন । আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম , “ ব্যাপারটা বড়ো গুরুতর । ” দুটো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম , কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল ।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য , কন্যার অন্ত্যেষ্টি-সৎকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল ।

আমার কন্যা শশী করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল , “ বাবা , ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল । ”

আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম , “ যা যা , তোর এত খবরে দরকার কী । ”

এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল । বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল । একমাত্র কন্যার বিবাহ , ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম । বাড়িতে

গৃহিণী নাই , প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল ।
সর্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল ।

গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাউঠায় ধরিল ।
রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল । অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল
ঔষধের শিশিগুলো ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া
ধরিলাম । কহিলাম , “ মাপ করো, দাদা , এই পাষণ্ডকে মাপ করো । আমার
একমাত্র কন্যা , আমার আর কেহ নাই । ”

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল , “ ডাক্তারবাবু , করেন কী , করেন কী ।
আপনার কাছে আমি চিরঋণী , আমার পায়ে হাত দিবেন না । ”

আমি কহিলাম , “ নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি , সেই পাপে
আমার কন্যা মরিতেছে । ”

এই বলিয়া সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম , “ ওগো ,
আমি এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি , আমি তাহার দণ্ড লইতেছি; ভগবান
আমার শশীকে রক্ষা করুন । ”

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম,
বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল ।

পরদিন দশটা-বেলায় গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে
চিরবিদায় গ্রহণ করিল ।

তাহার পরদিনেই দারোগাবাবু কহিলেন , “ ওহে আর কেন , এইবার বিবাহ
করিয়া ফেলো । দেখাশুনার তো একজন লোক চাই ? ”

মানুষের মর্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা শয়তানকেও শোভা পায় না । কিন্তু , নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে , কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না । দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চারুক মারিয়া অপমান করিল ।

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্ , কর্মচক্র চলিতেই থাকে । আগেকার মতোই ক্ষুধার আহার , পরিধানের বস্ত্র , এমন-কি চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয় ।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণ কণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে , “ বাবা , ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল । ” দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম , আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম , তাহার বন্ধকি জোতজমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম ।

কিছুদিন সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত , আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্মে পরলোকে কোনোমতেই শান্তি পাইতেছে না । সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে , বাবা , কেন এমন করিলে ।

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল , গরিবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ করিতে পারিতাম না । কোনো ছোটো মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত , আমার শশীই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্না বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে ।

তখন পুরা বর্ষায় পল্লি ভাসিয়া গেছে । ধানের খেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয় । ভোররাত্রি হইতে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে , এখনও বিরাম নাই ।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে । বাবুদের পাঙ্গির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে ।

ইতিপূর্বে এরূপ দুর্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত, তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না , এবং একটি ব্যগ্র কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারংবার সতর্ক করিয়া দিত । আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় মুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল । তাহার রুদ্ধ শয়নঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম , যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন । এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল । বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সংবরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম ।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি , থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা , একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম , “ কী রে । ” উত্তরে শুনিলাম গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে , থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূরগ্রাম হইতে বহিয়া আনিয়াছে । দেখিলাম , সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে । জমিদারি কাছারির অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল ।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি , তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে ; দারোগাবাবুর দর্শন মেলে নাই । আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম । সে তাহা ছুঁইল না ।

তাড়াতাড়ি আহাৰ সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্বার বাহির হইলাম । সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে । কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না , মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে । এখন তাহার কাছে এই নদী , ঐ গ্রাম , ঐ থানা , এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পক্ষিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো । বারংবার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম , একবার একজন কন্স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল , ট্যাঁকে কিছু আছে কি না । সে উত্তর করিয়াছিল , সে নিতান্তই গরিব , তাহার কিছু নাই । কন্স্টেবল বলিয়া গেছে , “ থাক্ বেটা , তবে এখন বসিয়া থাক্ । ”

এমন দৃশ্য পূর্বেও অনেকবার দেখিয়াছি , কখনো কিছুই মনে হয় নাই । আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না । আমার শরীর করুণাগদগদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল । ঐ কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজরগুলোকে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল ।

দারোগাবাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন । তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন ; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন । আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম । চীৎকার করিয়া বলিলাম , “ আপনারা মানুষ না পিশাচ ? ” বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা বণাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম , “ টাকা চান তো

দুৰ্বুদ্ধি

এই নিন , যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন ; এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন , ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক । ”

বহু উৎপীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল , তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল ।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি , তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিব্রংশ লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি , কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল ।